মৈত্রীশ ঘটক

শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক—বিদ্যুৎচাবুকের আঘাত

১

ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর ঠিক পরে লেখা একটি কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "..আর কেউ নেই যে কড়কাবে/বিদ্যুচ্চাবুকে এই মধ্যবিত্তি, সম্পদ, সন্তোষ/মানুষের, তুমি গেছ, স্পর্ধা গেছে, বিনয় এসেছে"। ঋত্বিকের ছবির অভিঘাতকে বিদ্যুৎচাবুকের ঘায়ের সঙ্গে তুলনা যথার্থ এবং আরেকজন সমমনস্ক শিল্পী বলেই তাঁর চোখে এতটা অব্যর্থভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু চাবুকটি কোথায় সবচেয়ে বেশি আঘাত করে? সেটা নির্ভর করে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে।

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মনে হচ্ছিল যে ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে নানা লোকের প্রতিক্রিয়া খানিকটা মনোবিদ্যায় যাকে বলে রোশ্যাক (rorschach) টেস্ট, তার মতো। একজনকে অস্পষ্ট কালির নকশার উপর কী দেখতে পাচ্ছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে মানুষটির মনোজগতের প্রতিফলন এবং চিন্তাভাবনার ধরণ বোঝা যায়। এটা সম্ভবত সমস্ত শিল্পকর্ম বা জীবনের অন্য নানা দিকের ক্ষেত্রেও খাটে—সেই যে একটা কথা আছে না, যে যেমন, সে তেমন জগৎ দেখে।

অর্থাৎ, যিনি দেখেছেন তাঁর দেখায় যা দেখছেন তার থেকে নিজের চিন্তার প্রতিফলন বেশি। যিনি পণ্ডিত তিনি পাণ্ডিত্যের রসদ পাবেন। যিনি উন্নাসিক, তিনি সমালোচনার অনেক মশলা পাবেন—তাঁর ছবিতে দৃশ্য ও সঙ্গীতের শৈল্পিক সৌন্দর্যের হয়তো প্রশংসা করবেন কিন্তু মেলোড্রামার ছোঁয়া এবং প্রাকৃত হাস্যরসের ব্যবহার তাঁদের অস্বস্তিতে ফেলবে। উদাহরণ হিসেবে ভাবুন 'অযান্ত্রিক' ছবির শুরুতে বরের লজঝড়ে গাড়িতে করে নিজের বিয়েতে যাওয়ার সময় নানা অভিব্যক্তি ও আনুষঙ্গিক আবহসংগীত; বা 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে নীতার পিতার ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের সনতের কাছে তার পড়াশুনো এবং চাকরি নিয়ে পরিকল্পনা শুনে নিজের পুত্রের বাউন্ডুলেপনা নিয়ে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া। আবার যাঁরা সাধারণ আখ্যানভিত্তিক ছবির দর্শক এবং সচরাচর আর্ট ফিল্মের চত্বর এড়িয়ে চলেন, ঋত্বিকের ছবির মানবিক অনুভূতির দিক তাঁদের উদ্বেল করে। আবার যিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন তিনি মানবিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ কী ভাবে শোষণমূলক রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে পিষ্ট হয়ে যেতে পারে তার নির্মম সমালোচনা দেখতে পাবেন। আর যিনি বোহেমিয়ান তিনি ঋত্বিকের কোনো কিছুকে পরোয়া না করা বাঁধনছাড়া ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ছবিতে তার প্রতিফলনকে কুর্নিশ জানাবেন।

নিজের কথায় আসি। পারিবারিক সূত্রে ঋত্বিক ঘটক আমার ছোড়দাদু, আমার ঠাকুরদা মণীশ ঘটক, যিনি 'যুবনাশ্ব' নাম সাহিত্যজগতে পরিচিত, তাঁর কনিষ্ঠতম ভাই। ওঁদের দুজনের মধ্যে বয়েসের তফাৎ প্রায় চব্বিশ বছর। ঋত্বিক আর মণীশ ঘটকের প্রথম সন্তান, আমার বড়পিসি মহাশ্বেতা দেবীর বয়স প্রায় এক। আমার বাবা মৈত্রেয়, যিনি মণীশ ঘটকের কনিষ্ঠতম পুত্র, তিনি আরো অনেকটা ছোট। ঋত্বিক ঘটক যখন মারা যান তখন আমার মাত্র আট বছর বয়েস, তাই তাঁর সাথে ছবি বা অন্য কিছু নিয়ে কোনো অর্থময় বিনিময় সম্ভব হয়নি। সম্বলে আছে ছোটবেলার কিছু গল্প, যা নিয়ে নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (অন্তটীকা দ্রষ্টব্য)। আশির দশকে কলকাতায় বড় হচ্ছি, তখন দূরদর্শনে রবিবারে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র সম্প্রচারিত হত। কোনো এক রোববারে 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে আমার কিশোর মনোজগতে বিস্ফোরণ ঘটল, যেন বিদ্যুৎচাবুকের ঘায়ে চমকে উঠলাম। সিনেমা এরকম হয়? এখনো তাঁর ছবি দেখতে গেলে অনেকটা মানসিক প্রস্তুতি লাগে। সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। কী অবস্থায় উঠব, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বক্সিংয়ে শুনেছি সোলার প্লেক্সাসে ঘুষি মারলে দম বন্ধ হয়ে আসে—শিলংয়ের পাহাড়ি উপত্যকায় নীতার "দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম" সংলাপ আর পাহাড়ে পাহাড়ে তার আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনি শুনে যে অনুভূতি হল, তা আগে কখনো হয়নি। পরেও সেই দৃশ্যটি বা 'সুবর্ণরেখা'-য় সীতার আত্মহত্যার দৃশ্য যখনই দেখেছি একইরকম অনুভূতি হয়েছে, যদিও গড়পড়তা আবেগঘন অশ্রুসজল বাংলা (বা হিন্দী) ছবিতে তুলনীয় দৃশ্য কোনো দাগ কাটে না, বরং অনেকসময়ই হালকা আমোদ বোধ হয়।

অনেকদিন বাদে, ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডনে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে, ঋত্বিক ঘটকের ছবির একটা রেট্রোস্পেক্টিভ হয়েছিল। আমি তখন সদ্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি শেষ করে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে কয়েকমাসের জন্যে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে অতিথি গবেষক হয়ে কাটাচ্ছিলাম। আমার এক অবাঙালি ভারতীয় বন্ধুর সাথে দেখতে গেছিলাম, যে তাঁর কোনো ছবি দেখেনি। ওই বিশেষ মুহূর্তে বিদেশের ওই পরিশীলিত পরিবেশে আমার বন্ধুসহ মূলত বিদেশী দর্শকদের কতজন যে কান্না চাপছিলেন তা দেখে সত্যি অবাক হয়েছিলাম।

২

সম্প্রতি ঋত্বিকের আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবিগুলো—যার মধ্যে আছে 'অযান্ত্রিক' (১৯৫২), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), এবং 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫)—আবার দেখতে গিয়ে ভাবছিলাম ওঁর ছবি আপাতভাবে খুবই বাঙালি হলেও বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলের কাছে তার আবেদনের কারণ কী? তিন দশকের প্রবাসী জীবনে অনেকবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমার পদবী শুনে বিদেশী কেউ আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিবারের কেউ কিনা জিজ্ঞেস করেছেন, এবং উত্তর শুনে তাঁর ছবি যে তাঁদের গভীরভাবে স্পর্শ করেছে সে কথা খুবই আন্তরিক ভাবে বলেছেন। অবাক লাগত, হয়তো যিনি বলছেন তিনি অ্যামেরিকার কোনো ছোট শহরে বড় হয়েছেন যেখান থেকে ভারত, বাংলা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা সবই অনেক দূরের ব্যাপার, তাঁর কী করে এতটা ভাল লাগতে পারে?

এর একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো সময় বা সমাজের প্রেক্ষাপট ছাপিয়ে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আবেগের একটা সর্বজনীন দিক আছে। শুধু সমসাময়িক বিদেশী ছবি বা সাহিত্য নয়, ঐতিহাসিক ছবি বা সাহিত্যও তো অন্য একটা সময়, অন্য একটা সমাজের ছবি তুলে ধরে কিন্তু তাহলেও সেই সব বিবরণ ছাপিয়ে মৌলিক কিছু আবেগ আমাদের স্পর্শ করে। ভাবুন, মহাভারতের মূল চরিত্রগুলি মূলত ভূমি রাজস্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, আর মাঝেমাঝেই যুদ্ধ করতেন জমি বা রাজত্বের দখল নিয়ে। কোনো বৌদ্ধিক বা শৈল্পিক কাজ নয় অশ্বরথ চালানো, তীরধনুক চালানো এবং অসিযুদ্ধ করা এই ছিল তাঁদের প্রধান গুণ। এরকম কারো সাথে আলাপ হলে কী নিয়ে কথা বলতেন তা ভেবে বার করা মুশকিল! অথচ কর্ণের শৈশবে মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া বা তাঁর পক্ষের পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তাঁর মূল্যবোধের জায়গায় অটুট থাকা আমাদের মুগ্ধ করে, তিনি কোথাও আমাদের কাছের লোক হয়ে পড়েন।

'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতার যুদ্ধ খুব অন্যরকমের। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অত্যন্ত দরিদ্র একটি উদ্বাস্তু পরিবারে কর্মরতা নারী—পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। কিন্তু একদিকে তাঁর দাদা গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নপূরণের সুযোগ পান, আর অন্যদিকে তাঁর বোন বিয়ে করে পারিবারিক জীবনে সুখের সন্ধান পান, যদিও যার সঙ্গে বিয়ে হয়, সেই সনতের নীতার সাথেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আর এ সবই হয় যে পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্যে তাঁর এই ত্যাগ, তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনসহ। নীতার আশা আকাঙ্ক্ষা কিছু পূর্ণ হল না শুধু নয়, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন। শিলংয়ের টিবি সানিটোরিয়ামে মুমূর্ষু নীতার যে আর্ত চিৎকার আমাদের বিপর্যস্ত করে দেয়, কোথাও সেটা কর্ণের অসম যুদ্ধে মৃত্যুর বেদনার মতো লাগে—একজন মানুষ, যার জীবন অন্যরকম হতে পারতো, কিছু মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ আঁকড়ে থাকার জন্যে এবং পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের স্বার্থপরতা ও নীতিবোধের অভাবের কারণে শেষ হয়ে গেল।

আবার আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম হলেও, 'অযান্ত্রিক' ছবিটির শেষটা 'মেঘে ঢাকা তারা'-র কথা মনে করিয়ে দেয়। রুক্ষ গ্রাম্য রাস্তায় বছরের পর বছর ধরে চালাবার পরে 'জগদ্দল' নামের লজঝড়ে গাড়িটির ইঞ্জিন শেষ পর্যন্ত খারাপ হয় এবং বিমল, যে সাধারণত বেশ মিতব্যয়ী, গাড়িটিকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য পুরো ইঞ্জিনটি মেরামত করার চেষ্টা করে কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এটা অনেকটা নীতার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মতো, এবং তার দাদা শঙ্করের তাকে বাঁচিয়ে তোলার মরিয়া চেষ্টার মতো, যা ব্যর্থতায় শেষ হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মানুষের বা মনুষ্যসম যন্ত্রের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক জট পাকিয়ে যায়, আর তার যে ট্র্যাজিক পরিণতি তা শুধু নীতা বা জগদ্দলের দিক থেকে না, যারা তাদের ভালবাসত তাদের জন্যেও। শঙ্কর এবং বিমল উভয়েরই যন্ত্রণা একই রকম বলে মনে হয়—একজন প্রিয়জনকে হারাবার জন্য দুঃখ আর তার জন্যে সময় থাকতে যথেষ্ট কিছু না করার জন্য, স্বার্থপর কারণে তাদের ব্যবহার করা বা ব্যবহার হতে দেওয়ার জন্যে অপরাধবোধের সঙ্গে জড়িত।

আবার দুটি ছবিই শেষ হয় এক ঝলক আশার আলোয়। কিন্তু এ সাধারণ মিলনান্ত বিনোদনমূলক ছবির আশাবাদ নয়, আরো জটিল কিছু। এক দিক থেকে দেখলে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি সত্ত্বেও জীবন চলতে থাকে এবং যারা চলে গেছে তারা তাদের প্রিয়জনদের জন্য কোনো স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিয়ে যায়, যা

তাদের সাথে জড়িত সুখস্মৃতির আবেশ আর অনুপস্থিতির বেদনা একই সাথে জাগিয়ে তোলে। 'অযান্ত্রিক-এ'র শেষ দৃশ্যে, একটি শিশুকে গাড়ির হর্ন নিয়ে খেলতে দেখা যায়, সেটা জগদ্দলেরই হর্ন। তার আওয়াজ শুনে বিমল ছুটে বেরিয়ে আসে যেন জগদ্দল ফিরে এসেছে। তারপর শিশুটিকে দেখে হর্নটি নিয়ে খেলতে, সে হাসে এবং তার চোখ জলে ভরে যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতার মৃত্যুর ঠিক পরে শোকার্ত শঙ্কর তাদের বাড়ির কাছের পাথুরে এবড়ো খেবড়ো রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণীর দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—দেখে মনে হয় সে কাজে যাচ্ছে, যেমন নীতা যেত এই রাস্তা দিয়ে। তার চটির স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে যায়, মেয়েটি লাজুক হেসে সেটা ঠিক করতে করতে শঙ্করের দিকে তাকায়, তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। তাকে দেখে শঙ্করের মুখে এক পলের জন্যে একটা হালকা হাসির আভাস দেখে যায়, যেন তার নীতার এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই শঙ্কর কান্নায় ভেঙে পড়ে—নীতার জীবনের ট্র্যাজেডি নিয়ে খেদ ও তাকে হারানোর ব্যক্তিগত কষ্টের যুগ্ম আঘাতে তার সব সংযম ভেঙে যায়।

'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা' থেকে অনুরূপ উদাহরণ মনে করা যেতে পারে। 'কোমল গান্ধার'-এর অনেকটা অংশ ধরে অনসূয়ার দোটানা চলছে নাটক, শিকড়ের টান, এবং ভৃগুর প্রতি সদ্যমুকুলিত প্রেম সব ছেড়ে চলে যাবে কিনা তার দীর্ঘদিন দেশছাড়া বাগদত্ত সমরের কাছে এই নিয়ে। এর নিরসন হয় ছবির অন্তিম অংশে যখন সে তার দাদার সঙ্গে গাড়ি করে দমদম বিমানবন্দরের দিকে রওনা হয় সমরের সাথে দেখা করতে কিন্তু তাকে সে প্রত্যাখ্যান করে ফেরত আসে ভৃগুর কাছে, তার নাটকের দলের সহকর্মীদের কাছে। 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে সীতার মৃত্যুর মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কিছুক্ষণ পরে একদম শেষ অংশে দেখা যাচ্ছে তার দাদা ঈশ্বর ও পুত্র বিনু সুবর্ণরেখা নদীর তীর ধরে হাঁটছে বাক্স প্যাঁটরা পোঁটলাপুঁটুলি নিয়ে, নতুন বাড়িতে যাবার আশায় বিনুর মুখ উজ্জ্বল। ঈশ্বর জানে যে ভবিষ্যৎ বাসস্থান বা জীবিকা অর্জন নিয়ে কোনোই নিশ্চয়তা নেই, তার ওপরে ছবিতে আগেই আমরা দেখেছি সে মিথ্যা কথা বলার, এমনকি তা যদি শিশুদেরও মন রাখতেও বলা হয়, তার বিরুদ্ধে। তবুও সে বিনুকে প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে নতুন বাড়িতে নিয়ে যাবে, বিনুর কল্পনায় যেখানে তার মা বাবা সবাই অপেক্ষা করে আছে। যেন ছবির শেষে ঈশ্বর বুঝতে পেরেছে এই জীবনসত্য যে সবকিছু হারালে আবার দীর্ঘ পথ হাঁটবার মনের জোর, নতুন করে বাঁচার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলতে গেলে স্বপ্ন এবং আশা ছাড়া উপায় নেই, তাতে যদি কিছু কল্পনা মিশেও থাকে, তো ক্ষতি কী?

৩

রোশ্যাক টেস্ট আমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কাজ করছে। ঋত্বিকের ছবি নিয়ে উৎসাহ মনোযোগী দর্শক হিসেবে, গবেষক বা বিশেষজ্ঞ হিসেবে নয়। আর পারিবারিক সূত্র বা বাম-প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা বাঙালি হওয়া ছাড়াও, অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর ছবির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তার অনেক খোরাক পাই।

আমার গবেষণার একটা মূল ধারা দারিদ্র্য ও অসাম্য নিয়ে। ঋত্বিকের ছবিতে দেশভাগ, দারিদ্র্য, ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এই থিমগুলো তো ঘুরে ফিরে আসেই, আরো যা আসে তা হলো নারীদের প্রতি

বৈষম্য। আমার প্রিয় যে ছবিগুলোর উল্লেখ করেছি তার প্রত্যেকটিতে মুখ্য বা পার্শ্ব চরিত্রে এরকম অন্তত একজন নারী আছেন। 'সুবর্ণরেখা'-য় মাধবী চক্রবর্তী অভিনীত সীতা চরিত্রটি বা 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতা চরিত্রগুলো তো আছেই, কিন্তু এই প্রসঙ্গে 'কোমল গান্ধার'-এ জয়া এবং 'অযান্ত্রিক'-এ কাজল গুপ্ত অভিনীত চরিত্রগুলির কথাও মনে করা যেতে পারে। এখন, উন্নয়নের অর্থনীতিচর্চার মূলধারার একটি বহুচর্চিত বিষয় হলো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপ কিভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রগতিকে ব্যাহত করে। এই ছবিগুলো আবার দেখতে দিয়ে মনে হচ্ছিল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংকট সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপন্নতা সৃষ্টি করে, তাদের জীবনে যে ট্র্যাজেডি নেমে আসে, তার ওপর তার সঙ্গে যখন সামাজিক বৈষম্য মেশে, তার তো অনেকটাই এড়ানো সম্ভব—প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, বা জীবনচক্রের অনিবার্য চক্রের আবর্তনে জরা-মৃত্যু-ব্যাধির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, এগুলো মানুষেরই হাতে তৈরি ট্র্যাজেডি। ঋত্বিকের ছবিতে এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ দেশভাগ, কিন্তু দারিদ্র্য ও সামাজিক রক্ষণশীলতার নাগপাশ সেগুলোও তো তার মধ্যে পড়ে। দর্শকের কোথাও যেন একটা খেদ থেকে যায় যে বিকল্প কোনো সমাজব্যবস্থায় এগুলো না-ই হতে পারতো, অর্থনীতিবিদ হিসেবে দারিদ্র্য ও অসাম্য নিয়ে বিকল্প নীতি বা অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা ভাবতে গিয়ে ঠিক যেমন মনে হয়।

শুধু দারিদ্র্য আর অসাম্য নয়, একজন অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক হিসেবে মানুষের অর্থনৈতিক বা সামাজিক জীবনে মনস্তাত্ত্বিক চালিকাশক্তি কী—সেখানে আর্থিক প্রণোদনা বা সামাজিক স্বীকৃতি বা মতাদর্শ বা মূল্যবোধের ভূমিকা কী—এও আমার বহুদিনের কৌতূহল এবং চর্চার বিষয়। জীবিকা অর্জন বা সামাজিক বাধ্যবাধকতার জন্যে আমরা যা করি, ভালো লাগে বলে বা ভালোবেসে যা করি, আর যা করা উচিত ভেবে যা করি, এই ত্রিমুখী শক্তির টানের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। আমার কাছে, ঋত্বিকের আলোচিত ছবিগুলোতে মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে এই তিনটি মৌলিক চালিকাশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বকে নাটকীয় করে তুলেছে।

কোথাও তা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বনাম পারিবারিক দায়িত্ববোধের রূপ নেয়—যেমন, 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় নীতা আর শঙ্করের চরিত্রদুটির মধ্যে বৈপরীত্য। কোথাও তা সাফল্য বা ব্যক্তিস্বার্থ বনাম শৈল্পিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সংঘাতের রূপে প্রতিভাত হয়—যেমন, 'কোমল গান্ধার'-এ নাটকের দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ভৃগুর চরিত্রটির আদর্শনিষ্ঠতার পাশে শান্তা চরিত্রটির স্বার্থান্বেষী এবং অনৈতিক আচরণের ফারাকের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কোথাও দ্বন্দ্ব আসে ভালোবাসা এবং সামাজিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে—যেমন 'কোমল গান্ধার'-এ অনসূয়া একদিকে প্রেম এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শিকড়ের টান আর অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতির চাপের মধ্যে দোটানায় পড়ে। সে তার প্রবাসী বাগদত্তের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে যাবে, নাকি ভৃগুর প্রতি আকর্ষণের টানে নিজেকে সমর্পণ করবে? প্রবাসে সুখী জীবনের হাতছানি নাকি নিজের শিকড়ের কাছে থাকার এবং আবার উদ্বাস্তু না হবার টান কোনটা মেনে নেবে? আবার কোথাও এই দ্বন্দ্ব প্রয়োজনের তাড়না বনাম মানবিক মূল্যবোধের সংঘাত হিসেবে দেখা দেয়, যার আঘাত এসে পড়ে প্রিয়জনদের উপর, এবং পারিবারিক সম্পর্ক বা ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যের শোষণমূলক দিকটি উদ্ঘাটিত করে। এক দিক থেকে শঙ্কর স্বার্থপর, এবং পরিবারের প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে সে সংগীতসাধনায় ডুবে আছে। তাতে গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার থেকেও হয়তো বেশি আছে সংগীতসাধনার প্রতি আত্মিক টান, শিল্পী হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করার তাগিদ। কিন্তু সেই কারণেই পরিবারের ভরণপোষণের যে ভার নীতার

ওপর পড়ে, তা আক্ষরিক এবং রূপক দুই অর্থেই ক্রমশ তার জীবনশক্তি শুষে নিতে থাকে। অথচ শঙ্কর তার বোনকে ভালবাসে এটাও সত্যি—তাকে বাঁচাবার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তার মৃত্যু তাকে স্পষ্টতই গভীর আঘাত দেয়। একইভাবে, বিমল এক দিক থেকে দেখলে একজন স্বার্থপর মানুষ—সে কৃপণ এবং রুজিরোজগারের জন্যে সে জগদ্দলকে ভারবাহী পশুর মতো ব্যবহার করে, সময়মতো মেরামত করে না খরচ বাঁচাতে। আবার তার জগদ্দলের প্রতি স্নেহও সত্যি, তার লজঝড়ে হাল দেখে কেউ সমালোচনা করলে সে রেগে যায়, ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমে জল ঢেলে দেয় পরম মমতায় যেন তৃষ্ণার্ত প্রিয়জনকে গ্লাসে করে জল খাওয়াচ্ছে। আর জগদ্দল একদম ভেঙে পড়লে সে খরচের কার্পণ্য করে না, যেন কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুর জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন।

এমন একটি সমাজ কল্পনা করা মুশকিল যেখানে মানুষ একে অপরকে (বা প্রাণী, প্রকৃতি, এমনকী যন্ত্রকে) শোষণ করে না, নিজের আর্থিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে না। ঋত্বিক বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' তো বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলোর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে 'অযান্ত্রিক'-এ আদিবাসী জীবনের একটি ঝলক, বা 'কোমল গান্ধার'-এ আদর্শবাদী একদল তরুণ তরুণীর সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিল্পের সাধনা ও ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন, বা 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় শঙ্করের সংগীতপ্রেম মনে করা যেতে পারে, যা বাজারের যুক্তি দ্বারা কলুষিত নয়।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত কিছুর ওপর আর্থিক মূল্য আরোপ করা যেতে পারে (যেমন জঞ্জালের মূল্যে জগদ্দলকে বিক্রি করা দেওয়া) বা আর্থিক প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে মানুষকে বলি দেওয়া যেতে পারে (সংসার খরচ চালানোর পয়সা রোজগারের চাপে আস্তে আস্তে নীতাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া বা আর্থিক অনটনে সীতার দেহোপজীবিনী হতে বাধ্য হওয়া এবং তার মর্মান্তিক পরিণতি) তা আমাদের অমানবিক করে তোলে, আমরা যা কিছু ভালবাসি তাকে ধ্বংস করার পথে এগিয়ে দেয়। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

ঋত্বিকের এই ছবিগুলোতে কোনো রাজনৈতিক পথের দিশা প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও, এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যা আমাদের শোষক বা শোষিত হয়ে উঠতে বাধ্য করে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে ঘুরে দাঁড়ানোর, প্রতিরোধ করার চেষ্টা আছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রয়াসগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, তবু তারা একটি বিকল্প পথের সম্ভাবনার দিকেও ইঙ্গিত করে। এর মধ্যেই দর্শকদের অনুপ্রাণিত করার শক্তি নিহিত রয়েছে। শিল্পে ও সাহিত্যে পরাজিত নায়কেরা ব্যক্তি হিসেবে অনেক সময় আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন (যেমন, মহাভারতে কর্ণ) কারণ তাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতা বা খ্যাতির আকর্ষণের বাইরে বৃহত্তর কোনো নীতি বা আদর্শবোধের জন্য দাঁড়ানোর সাহস দেখানো যে সম্ভব, তার উদাহরণ হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু এই অনুপ্রেরণা দর্শকদের যে উপলব্ধিতে নিয়ে যায় তা আলো-ছায়া মেশানো। ঋত্বিকের ছবিতে মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর (শিল্প, প্রকৃতি, ভালবাসা) তার প্রতি একটি শিশুসুলভ মুগ্ধতার সঙ্গে নানা মলিনতার ছায়া, ব্যর্থতা, বিচ্ছেদ, ও বিনাশের ভয়াবহ বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা সবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রিয়জন বা নিজের জীবন নিয়ে আশা-স্বপ্নই হোক বা পারিবারিক বাড়ি অথবা জরাজীর্ণ গাড়িই হোক, মূল্যবান কিছু হারানোর সঙ্গে মানুষ কীভাবে

মোকাবিলা করে, ভেঙে পড়ে আবার কী করে উঠে দাঁড়ায়, তাঁর ছবিগুলোতে এই থিমগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে।

আমার মনে হয় বিকল্পধারার ছবির দর্শকের সীমিত গন্ডির বাইরে ঋত্বিকের ছবির মরণোত্তর জনপ্রিয়তার পেছনে এই জীবনবোধের ভূমিকা আছে। জীবন মানুষকে নির্মম আঘাত করে, ভেঙে দেয়, আবার জীবনই মানুষকে সমস্ত দুঃখকষ্ট মলিনতা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার, ভালবাসার, সৌন্দর্য উপলব্ধি করার, ঘুরে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা যোগায়। একে জীবনদর্শন বা আধ্যাত্মিকতা ভাবা যেতে পারে, আবার জীবনকে তার সমস্তকিছু নিয়ে প্রায় শিশুসুলভ সারল্যে আলিঙ্গন করা, যাপন করার জীবনবোধও ভাবা যেতে পারে। 'সুবর্ণরেখা'-র ছবির শেষ দিকে মাতৃহারা বিনু তার সম্পর্কে আপন মামা ঈশ্বর, তার একমাত্র জীবিত আত্মীয় অথচ যাকে সে চেনে না, তাঁর সঙ্গে আক্ষরিক ও রূপক দুই অর্থেই অনিশ্চিত নতুন জীবনপথের যাত্রা শুরু করছে, কিন্তু তার মুখে হাসি এবং কিছুক্ষণ আগেই ধানের খেতে রৌদ্রছায়া দেখে তার মায়ের গলা মনে পড়েছে, আর নেপথ্যে বাজছে সেই গান। 'কোমল গান্ধার'-এ নিষ্পাপ মুখের এক পথশিশু ছবির একাধিক দৃশ্যে অনসূয়ার শাড়ি ধরে টান দেয়, কখনো পয়সা কখনো অব্যক্ত কিছু চায়, যেন সে অনসূয়ার সমস্ত দোটানা আর পিছুটানের মূর্ত প্রতীক। আর এই প্রসঙ্গে 'অযান্ত্রিক' আর 'মেঘে ঢাকা তারা'-র ছবির শেষের অনুরূপ দৃশ্যের কথাও মনে পড়বে, যার কথা আগেই লিখেছি।

ঋত্বিকের কিছু ছবির জনপ্রিয়তার পেছনে এই মৌলিক উপাদানটির একটা বড়ো ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়। আলোচিত ছবিগুলোর মধ্যে 'কোমল গান্ধার' বাদ দিলে 'মেঘে ঢাকা তারা', 'অযান্ত্রিক', আর 'সুবর্ণরেখা' তুলনায় সরল আখ্যানভিত্তিক ছবি। এগুলোতেও ঋত্বিক ক্রমাগত প্রথাগত ছক ভাঙছেন, আলো-ছায়া-অন্ধকার মিশছে কাহিনীর বিন্যাসে, চিত্রায়নে এবং সংগীতের ব্যবহারে, পরিচিত উপাদান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হচ্ছে অথচ কোথাও আরোপিত বা 'শিল্পের জন্য শিল্প' মনে হচ্ছে না। যেমন, মেলোড্রামার শৈল্পিক ব্যবহারের উদাহরণ হিসেবে 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় শিলংয়ের টিবি সানিটোরিয়ামে নীতার আর্তচিৎকারের অংশটি আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু সেটা নয়, আমার মনে হয় ওই ছবিতে আরেকটি অসাধারণ উদাহরণ হলো দেবব্রত বিশ্বাস এবং গীতা ঘটকের কণ্ঠে শঙ্কর এবং নীতার গাওয়া দ্বৈতসংগীত। একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার এখানে আমাদের এক বিপন্ন উপলব্ধির মুখোমুখি করে—একটি আধ্যাত্মিক গান যাকে সঙ্কটের সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস ভাবা যেতে পারে, ছবির এই অংশে তার ব্যবহার বিধ্বংসী হয়ে দাঁড়ায়—যেন কোনো শক্তি নীতাকে তার আসন্ন ট্রাজেডির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না তার ভবিষ্যদ্বাণী করা শোকগাথা হয়ে দাঁড়ায়। আবার, 'কোমল গান্ধার'-এ শিলংয়ের পাহাড়ে দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে ঋষির গাওয়া আরেকটি অতিপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতের চিত্রায়ন ভাবা যেতে পারে। ঘটনাচক্রে একই অভিনেতা এবং একই গায়ক, এবং দুটিতেই আকাশ ছোঁয়ার অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। অথচ একটিতে তা নিজস্ব ক্ষুদ্র পরিসরের আশ্রয়ে রাতের অন্ধকারে বৃহত্তর শক্তির দ্বারা বিপন্ন হওয়া নিয়ে আর্তির রূপে, আর অন্যটিতে পরিচিত গন্ডীর বাইরে এসে রৌদ্রকরোজ্জ্বল পর্বতমালায় প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্যের সহর্ষ উদযাপনে। পরিচিত গানগুলির এরকম ব্যবহার একদিক থেকে তাঁর ছবিকে সর্বশ্রেণীর দর্শকের কাছে অভিগম্য করেছে।

আবার একই সঙ্গে এই গানগুলি ঋত্বিকের ছবির জীবনদর্শনের নির্যাস হিসেবেও কাজ করে—তা আমাদের স্বপ্ন দেখায়, মুগ্ধ করে, আঘাত দেয়, ভেঙে দেয়, আবার তিলে তিলে গড়েও তোলে। সেই বিপন্ন বিস্ময়ই মনে হয় বিদ্যুৎচাবুকের ঘা।

[এই লেখাটি সদ্যপ্রকাশিত Shamya Dasgupta সম্পাদিত Unmechanical: Ritwik Ghatak in 50 Fragments, Westland বইয়ে আমার "An Electric Whip" প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, যা বাংলায় আংশিকভাবে 'ডাকবাংলা' অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে কিছু পারিবারিক স্মৃতিচারণ এই দুটি লেখায় আছে।]